আব্দুল বায়েস

ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপান্তরের 'গুপ্ত' রহস্য

'People always fear change. People feared electricity when it was invented, didn't they? People feared coal, they feared gas-powered engines...There will always be ignorance, and ignorance leads to fear. But with time, people will come to accept their silicon masters' - Bill Gates

এক. আজ থেকে প্রায় চার দশক আগে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ জে স্টিগলার বলেছিলেন, 'পণ্ডিতদের বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই যে তথ্য একটা মূল্যবান সম্পদ : জ্ঞানই শক্তি। তার পরও অর্থনীতির শহরে তার বসতি বস্তিতে। অনেকটাই অবজ্ঞায়।'

বাজারে অপ্রতিসম তথ্যপ্রবাহের (Asymmetric information) প্রভাব নিয়ে গবেষণা করে ২০০১ সালে নোবেল জিতেছেন যে তিনজন, তারা হলেন জে স্টিগলিৎজ, জি একারলফ ও মাইকেল স্পেন্স। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি তথা আইসিটির সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন বাজারে বিদ্যমান তথ্যপ্রবাহে সেই অসমতা দূর করতে সাহায্য করে বলে আজ তার এত কদর সব জায়গায়। ফলে শুধু উৎপাদক ও ভোক্তার উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পায় তা নয়, সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিও ঘটে। মোট কথা, পাঠ্যবইয়ে পড়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ক্রেতা ও বিক্রেতার বাজার সম্পর্কে পূর্ণ ধারণার শর্তটি বাস্তবে রূপ নেয় না অপ্রতিসম তথ্যের জন্য। জে একারলফের 'মার্কেট ফর লেমনস' (আমেরিকায় ত্রুটিপূর্ণ গাড়িকে লেমন বলা হয়) বলতে চায়, ভালো কিংবা খারাপ গাড়ির তথ্য একমাত্র বিক্রেতার কাছে থাকে, ফলে তিনি খারাপ গাড়িটা গছিয়ে দেন ক্রেতার ঘাড়ে। এক্ষেত্রে আইসিটি কিছুটা হলেও আলোর সন্ধান দিতে পারে।

গত ৫০ বছরে বাংলাদেশে আইসিটি তথা তথ্যপ্রবাহের যে 'বিপ্লব' ঘটেছে তা যেন উন্নয়ন আলোচনায় গুরুত্ব পায়, সেদিকে নজর দেয়ার উপদেশ রেখে আজকের নিবন্ধ শুরু করা যেতে পারে।

তার আগে একটু পেছনে ফিরে যাওয়া যাক।

পূর্বপ্রজন্মের মানুষদের হেমন্ত কুমারের গাওয়া 'রানার' গানটি নিশ্চয় মনে আছে—বাংলার গ্রামের ডাক হরকরা, দিন-রাত রোদবৃষ্টি উপেক্ষা করে রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে। পোস্টমাস্টার টরেটক্কা টরেটক্কা করে টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছেন; তারবাহী টেলিফোনে কানফাটা চিৎকারে চারদিকে জানান দিয়ে কথা বলছেন কেউ। পাপিয়া সারওয়ারের গানটি ছিল দারুণ—'নাই টেলিফোন, নাইরে পিয়ন নাইরে টেলিগ্রাম/ বন্ধুর কাছে মনের খবর কেমনে পৌঁছাইতাম।' সেই আমলে টেলিফোন কিংবা টেলিগ্রাম ছাড়া খবর পৌঁছানো ছিল কঠিন। বিশেষত শহরে গুটিকয়েক সৌভাগ্যবানের ঘরে অ্যানালগ টেলিফোন ছিল, যা পেতেও, 'কানেকশন' চালাতেও 'কানেকশন' লাগত; দীর্ঘসূত্রতা ও দীর্ঘশ্বাসের কথা না-ইবা বলা হলো। ১৯৯৭ সালে বর্তমান নিবন্ধের লেখক যখন আইসিটির ওপর এক গবেষণা চালান, তখন 'ভিলেজ পে ফোন' প্রকল্পের আওতায় ঢাকার আশপাশে মাত্র ১০০টি গ্রামে সেলফোন ছিল; যা বর্তমানে প্রায় প্রতি ঘরে; একটা কম্পিউটারের দাম লক্ষাধিক টাকা, এখন ২০ থেকে ২৫ হাজারের মতো; বর্তমানে উঁকিঝুঁকি মারছে ফাইভজি—জয়তু বাংলাদেশ।

সুতরাং সেদিন গতপ্রায়। রানার, পোস্টকার্ড, মানি অর্ডার এনভেলপ এখন স্মৃতির অতলান্তে, ইতিহাসের পাতায়। পোস্টঅফিস এখনো বেঁচে আছে বাহাদুর শাহের বংশধরদের মতো। আজকাল চলছে তারবিহীন তেলেসমাতি—চিঠি মানে এসএমএস, ই-মেইল, ইন্টারনেট; টাকা আসে-যায় বিকাশে, গোপনীয় খবর হোয়াটসঅ্যাপ কিংবা মেসেঞ্জারে। পৃথিবী যেমন বদলে গেছে, তেমনি গেছে বাংলাদেশ—অ্যানালগ টু ডিজিটাল বাংলাদেশ! রূপান্তরের রূপকথা ব্যাখ্যায় এক অসামান্য অনুচ্ছেদ!

দুই. বিআইডিএস আয়োজিত সম্প্রতি এক কনফারেন্সে ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে বক্তব্য রাখলেন গবেষণা পরিচালক মনজুর হোসেন, 'আইসিটি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি : অর্থনীতির পুনরুদ্ধারে ডিজিটালাইজেশন কৌশল পুনর্বিবেচনা' শিরোনামে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ দর্শনের সূত্রপাত ২০০৯ সালে উন্নয়নের পরিবর্তিত কৌশল হিসেবে এবং সেই লক্ষ্যে নীতিগত সংস্কার ও বেশ বড় মাপের বিনিয়োগ অব্যাহত থাকল। সন্দেহ নেই যে সময়ের বিবর্তনে আইসিটিকেন্দ্রিক নির্দেশকে প্রভূত উন্নতি লক্ষ করা গেছে। যথা সেলফোন পেনেট্রেশন, টেলিডেনসিটি, ইন্টারনেটের ব্যবহার, ই-গভর্ন্যান্স ইত্যাদি। প্রসঙ্গত, অন্যান্য সূত্র থেকে ধার করে প্রাপ্ত কিছু তথ্য পেশ করা যেতে পারে : ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর অনুপাত তিন গুণ বৃদ্ধি—২০১৩ সালের প্রায় ৭ শতাংশ থেকে ২০১৭ সালে ১৮ শতাংশ; ২০২১ সালের মে মাসে মোট ইন্টারনেট গ্রাহক ১১৭ মিলিয়ন, যার মধ্যে প্রায় ১০ শতাংশ ব্রডব্যান্ড এবং বাকিরা ইন্টারনেট মোবাইল ব্যবহারকারী; নিবন্ধনকৃত সফটওয়্যার ও আইটি ১৫০০; টেলিযোগাযোগ ব্যতীত আইসিটি খাতে ১০ লাখ পেশাজীবী নিয়োজিত এবং আইসিটি রফতানি ১ বিলিয়ন ডলারের, প্রায় ৮০ শতাংশ খানায় সেলফোন সুবিধা আছে ইত্যাদি।

গত দশকের ৬ শতাংশের ওপর প্রবৃদ্ধির হার ও সেলফোন পরিগ্রাহণের প্রকোপ বৃদ্ধি আপাতদৃষ্টে ডিজিটালাইজেশন ও অগ্রগতির সহগামিতার সাক্ষ্য বহন করে। ডিজিটালাইজেশন ও উদ্ভাবন অর্থনীতির বিভিন্ন খাতকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে আসছে। আইসিটি খাতের উৎপাদন সরাসরি মূল্য সংযোজিত দ্রব্য ও সেবা সৃষ্টিতে অবদান রাখে। তাছাড়া আইসিটি উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে খাতগুলো দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা উন্নীত করতে পারে; যা মোট অর্থনীতির জন্য মঙ্গলজনক।

যেমন ২০১০ এবং পরবর্তী সময়ে তৈরি পোশাক আর রেমিট্যান্সের নিম্নগামী অবদানের মুখে আইসিটির ব্যাপক ব্যবহার একই সঙ্গে মোট উপাদান উৎপাদনশীলতা (টোটাল ফ্যাক্টর প্রডাক্টিভিটি, টিএফপি) ও শ্রম উৎপাদিকা (লেবার প্রডাক্টিভিটি) বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারত। আবার বোধগম্য নীতি সংস্কারের অনুপস্থিতিতে হয়তো বিনিয়োগ ও পুঁজির দক্ষতা বাড়িয়ে ২০১০ সময়ের বর্ধিষ্ণু প্রবৃদ্ধির ব্যাখ্যা মিলবে ডিজিটালাইজেশনে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গবেষণার পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, আইসিটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রচুর অবদান রাখে, যথা যুদ্ধোত্তর আমেরিকার প্রবৃদ্ধিতে জ্বালানি জুগিয়েছে আইসিটি ও সেমিকন্ডাক্টর শিল্প। আইটি উৎপাদনকারী শিল্প যুদ্ধোত্তর প্রবৃদ্ধির প্রায় ৮ শতাংশ এবং যুদ্ধোত্তর উৎপাদনশীলতায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অবদান রেখেছিল। ভারতে সফটওয়্যার সেবা রফতানি মোট সেবা রফতানির ৪৫ শতাংশ এবং মোট জিডিপির ৩ দশমিক ৫ শতাংশ।

এমন উদাহরণ আরো আছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ২০১৩ সালের হিসাব মতে, যা মনজুর উল্লেখ করেছেন, একটা দেশে ডিজিটালাইজেশন যদি ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, তাহলে ওই দেশের মাথাপিছু জিডিপি বাড়বে শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ এবং বেকারত্বের হার কমবে ১ দশমিক ২ শতাংশ। অন্য এক গবেষণা দেখিয়েছে যে মোবাইল ব্যবহারকারীর আয় বৃদ্ধি ঘটে ৩-১০ শতাংশ, যেমন ক্ষুদ্র ব্যবসা ও রেমিট্যান্স থেকে—নারীদের ক্ষমতায়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং সংকটের সময় ভোগ মসৃণকরণে ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া ব্রডব্যান্ড পেনিট্রেশনের হার ১০ শতাংশ বাড়াতে পারলে বার্ষিক মাথাপিছু জিডিপি বৃদ্ধি পায় এক থেকে দেড় শতাংশ।

মনজুর হোসেনের গবেষণার গন্তব্যস্থল বাংলাদেশে আইসিটির অবদান কত এবং কীভাবে তা পরবর্তী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মোট উপাদান উৎপাদনশীলতায় সাহায্য করে। তিনি প্রবৃদ্ধির ওপর আইসিটির প্রভাব দেখতে গিয়ে মোট প্রবৃদ্ধিকে দুদিক থেকে শনাক্ত করেছেন—উপকরণ শ্রম ও পুঁজির প্রভাব এবং মোট উপাদান উৎপাদনশীলতা (টিএফপি)। তবে তার আগে তিনি বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধির চালক নিয়ে কয়েকটা কথা বলেছেন—ক) গত দশকগুলোর তুলনায় ২০১০-এর দশকে প্রবৃদ্ধির উল্লম্ফন; (খ) রফতানিতে তৈরি পোশাকের অবদান বৃদ্ধি পেয়ে থাকলেও ২০১০-এর পর থেকে নেমে আসছে; (গ) রেমিট্যান্সপ্রবাহও পড়ন্ত, তবে ২০১৯ থেকে প্রান্তিক উর্ধ্বমুখী এবং (ঘ) ২০১০-এর পর থেকে মোট উপাদান উৎপাদনশীলতা ও শ্রম উৎপাদনশীলতা ক্রমে উর্ধ্বমুখী হয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ দর্শনের সূত্রপাতের বার্তাবাহক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

শক্তিশালী ইকোনমেট্রিক হিসাব-নিকাশে প্রবৃদ্ধি ও আইসিটির যোগসূত্রতা নির্ণয়ে এটাই প্রথম প্রচেষ্টা বলে আমাদের ধারণা—অন্তত বাংলাদেশে। প্রথমত, জিডিপিতে আইটি সম্পর্কিত খাতের অবদান প্রায় ১৩ শতাংশ—ভারতের ২৬ শতাংশের বিপরীতে; আইসিটি উৎপাদনকারী খাতের জিডিপিতে অবদান প্রায় ২ থেকে ৩ শতাংশ।

দ্বিতীয়ত, টেলি-ডেনসিটি ও আইসিটি মোট উপাদান উৎপাদনশীলতা ও প্রবৃদ্ধির ওপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে। অন্য কথায়, ২০১০-এর দশকে উল্লেখ করার মতো সংস্কারের অনুপস্থিতিতে আইসিটিতে বিনিয়োগ ও ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া একমাত্র দৃশ্যমান নীতি সূচক পরিবর্তনের প্রকাশ।

তৃতীয়ত, আইসিটি উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী উভয়েরই আর্থিক ও মুদ্রানীতিনির্ভর উৎসাহ প্রদান করা উচিত, যাতে খাতগুলো বড় মাপের উদ্ভাবনে নিবিষ্ট হতে পারে। এই কভিডের মধ্যে আমরা ডিজিটালাইজেশনের বিরাট সুবিধা পেয়েছি। তাই দ্রুত রিকভারির জন্য আর্থিক ও মুদ্রাবিষয়ক ব্যবস্থাপনার সুবিস্তার প্রয়োজন এবং বলা বাহুল্য, ডিজিটাল অর্থনীতি বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়ন সম্ভাবনাকে আহরণ করে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও ভারসাম্য উন্নয়নের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়তা দিতে পারে।

তবে মনজুরের উপস্থাপনায় 'ডিজিটাল ডিভাইড' বিষয়টি অনুল্লেখ থাকার কারণ হয়তো সময়ের অভাব কিংবা অপ্রাসঙ্গিকতা। প্রত্যেক বৃদ্ধি বা উন্নয়নের গল্পে বঞ্চনার ব্যাপার থাকে। তাই বেশি প্রবৃদ্ধি যেমন বেশি বৈষম্যের বাহক হয়, তেমনি ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট ডিজিটাল ডিভাইড আমন্ত্রণ জানাতে পারে। অনলাইন ক্লাস নিয়ে গর্ব করতে পারি, কিন্তু গ্রামের গরিব ও নিম্নমধ্যবিত্ত খানার ছেলে-মেয়েরা যে তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, এটি বলা বাহুল্য নয় আশা করি। নতুন প্রযুক্তির ধর্ম এমন যে প্রথম সে ধনী ও মাঝারিদের মধ্যমণি হয়ে থাকে, কিন্তু সময়ের বিবর্তনে সুযোগ ও সামর্থ্য সাপেক্ষে খুব গরিবও তা গ্রহণ করে। যেমন উফশী ধান, (আন) স্মার্ট সেলফোন। রাষ্ট্রের উচিত লক্ষ রাখা যেন ডিজিটাল ডিভাইড ডিজিটাল ডিভিডেন্ড হিসেবে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে। আবার ই-কমার্সের সার্মগ্রিক অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি দৃঃখজনক হলেও সত্যি যে এসব ঘটে যথাযথা তদারকির অভাবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার কারণে।

আসলে বাংলাদেশ দুটো ডিভিডেন্ডের দুয়ারে দাঁড়িয়ে—ডেমোগ্রাফিক ও ডিজিটাল ডিভিডেন্ড—যা ভাগ্য খুলে দেয়ার চাবি হিসেবে থাকছে।

আইসিটি উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী উভয়েরই আর্থিক ও মুদ্রানীতিনির্ভর উৎসাহ প্রদান করা উচিত, যাতে খাতগুলো বড় মাপের উদ্ভাবনে নিবিষ্ট হতে পারে। এই কভিডের মধ্যে আমরা ডিজিটালাইজেশনের বিরাট সুবিধা পেয়েছি। তাই দ্রুত রিকভারির জন্য আর্থিক ও মুদ্রাবিষয়ক ব্যবস্থাপনার সুবিস্তার প্রয়োজন এবং বলা বাহুল্য, ডিজিটাল অর্থনীতি বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়ন সম্ভাবনাকে আহরণ করে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও ভারসাম্য উন্নয়নের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়তা দিতে পারে। তবে মনজুরের উপস্থাপনায় 'ডিজিটাল ডিভাইড' বিষয়টি অনুল্লেখ থাকার কারণ হয়তো সময়ের অভাব কিংবা অপ্রাসঙ্গিকতা

আব্দুল বায়েস : অর্থনীতির অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির খণ্ডকালীন শিক্ষক